বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, দ্বাবিংশতিতম বর্ষ
সংখ্যা ১৪২৯-১৪৩০ বঙ্গাব্দ/জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
ISSN: 1605-7023 (Print)
DoI: https://doi.org/10.36609/blp.i22.577

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
http://journals.bpatc.gov.bd/index.php/blp

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: গণতন্ত্র ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক অন্বেষণ

মোহা. মাহামুদুল হক[১]

Abstract

Democracy accelerates economic development of a country. This article explores the nexus between Sheikh Hasina's homecoming, and Bangladesh's democracy and development using historical method, and development indicators. Sheikh Hasina returned home on 17 May 1981 defying all obstacles of the then government after five-year-and-nine-month of exile following 15 August assassination of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and most of his family members. This study shows that Sheikh Hasina's homecoming is of utmost important in the history of democracy and development of Bangladesh. Because, her return and subsequent democratic movements had forced the military dictator to hand over power to the caretaker government for holding the parliamentary election. Later, securing fourth term as the Prime Minister, Sheikh Hasina has made the country a role model of development in the world. Bangladesh has now a glorified story of growth and development aspiring to be an upper-middle income country by 2031 because of her visionary leadership, and strictness to fulfil the dream of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. This study suggests rooting out corruption, reducing rate of unemployment, combating price hike of essentials, and strengthening soundness of democracy to make the country 'Sonar Bangla' by 2041.

ভূমিকা

১৯৮১ সালের ১৭ মে জাতীয় জাগরণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও বাংলাদেশের পুনর্জন্মের জন্য ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কেননা, ছয় বছর বিদেশে অবস্থান করে এইদিন সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাবা-মা-তিনভাইসহ নিকটাত্মীয়ের নিষ্ঠুর রক্তক্ষরণের দুঃসহ যন্ত্রণা মাথায় নিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন না করলে বাংলাদেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ইতিহাস অন্যভাবে প্রবাহিত হতো। দীর্ঘ ২৪ বছরের বাঙালী জতিসত্তার বিকাশ ও বাঙালী মুক্তির আন্দোলন তথা দেশের স্বাধীনতা অর্জন করে বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ

[১]সহকারি অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর (সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি, পৃষ্ঠা-৭৯)

মুজিবুর রহমান তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর মাধ্যমে স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে আত্মনিয়োগ করেন ঠিক তখনই স্বাধীনতা বিরোধী চক্র পরিবারের সকল সদস্যসহ তাঁকে হত্যা করে। বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশ হয়েছে আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র, ও উন্নয়নের সঙ্গে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক পদ্ধতিগত অনুসন্ধান করা হয়েছে এ নিবন্ধে।

উদ্দেশ্য

- ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড পরবর্তী শেখ হাসিনার অবস্থা ও অবস্থান উপস্থাপন;
- ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন পর্যালোচনা;
- ১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে আগমন-পরবর্তী অবস্থা বিশ্লেষণ;
- শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান।

গবেষণা পদ্ধতি

ইতিহাস ও উন্নয়ন বিষয়ক অনুসন্ধানে একাধিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণায় তাই ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও উন্নয়ন পরিমাপক মৌলিক সূচকসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও ড. ওয়াজেদ মিয়ার প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকাশিত স্মৃতিচারণ, প্রকাশিত চিঠিপত্র, বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধ-নিবন্ধ তথ্যের উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন পরিমাপে সরকারি-বেসরকারি ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্থার ওয়েবসাইট, রির্পোট ও প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিমাপে বিভিন্ন সূচক ব্যবহার করা হয় যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সূচক জীবনযাত্রার মান অর্থাৎ জিডিপি, অর্থনৈতিক কাঠামো, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং সামাজিক সূচকের মধ্যে রয়েছে স্বাক্ষরতার হারসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, চাকরি ও বেকারত্বের হার। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগ প্রভৃতি সূচকও বিশ্লেষণের আওতায় নেওয়া হয়েছে (Index Mundi, 2022)। প্রাপ্ত তথ্য বর্ণণাত্মক বিশ্লেষণ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বিশেষণ দিয়ে বিশেষায়িত করে শেখ হাসিনাকে বর্ণনা করার অনেক পথ-পরিক্রমা রয়েছে কিন্তু এ নিবন্ধে বিশেষণ পরিহার করে নিরেট তথ্য-উপাত্ত ও ইতিহাসের বাস্তবতার নিরিখে পদ্ধতিগতভাবে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন-এর আন্তঃসম্পর্ক অন্বেষণ করা হয়েছে। কেননা, ইতিহাস বর্ণনায় বিশেষণ তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতার ওপর প্রশ্ন উত্থাপনে সহায়ক। সার্বিক বিশ্লেষণেও বিশেষণজনিত ডিসকোর্স পরিহার করা হয়েছে।

তত্ত্বগত ও তথ্যগত প্রেক্ষিত

গণতন্ত্র উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত, আবার উন্নয়ন গণতন্ত্রেরও অন্যতম প্রভাবক। এ নিয়ে জ্ঞানবিশ্বে বিতর্ক শুরু হয় ১৭ শতকের দিকে (Hobbes, 1967, Harrington, 1656/1992)। গণতন্ত্র একটি অ-অর্থনৈতিক অনুসঙ্গ (non-economic factor) কিন্তু তা উন্নয়ন পরিমাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক (Karış, 2020)। উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন (Lipset, 1959; Heliwell, 1994; Barro, 1996; Rodrik, 2000; Djezou, 2014)। ১৯৮০-এর দশকে গণতন্ত্রকে মুক্তবাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রভাবক মনে করা হয়। আবার গণতন্ত্র উন্নয়নের ফলস্বরূপ বিকাশিত হয়- এমন ধারণাও গ্রহণ করা হতো ওইসময় (Adejumobi, 2000)। Lipset (1959) দেখিয়েছেন যে উন্নয়ন ও গণতন্ত্র সম্পর্কিত। তবে কেউ কেউ উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের মধ্যে পদ্ধতিগত সম্পর্ক নেই বা গণতন্ত্র উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলেও দাবি করেছেন (Barro, 1996; Tavares & Wacziarg, 2001; Collier & Hoeffler, 2009; Aisen & Veiga, 2013; Rachdi & Saidi, 2015)। উন্নয়ন সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন করে যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তথা গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত করে (Lipset, 1959; Needler, 1967)। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় (Olson, 1983; Przeworski & Limongi, 1993; Leblang, 1996, 1997)। শুধু উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র অর্জন করা যায় না, অথবা শুধু গণতন্ত্র উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয় (Karış, 2020)। Sirowy & Inkless (1990) তিনটি প্রধান মনোভঙ্গির (approach) উল্লেখ করেছেন যা গণতন্ত্র ও উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিভাত করে। এগুলো হলো: ক. দ্বান্দ্বিক মনোভঙ্গি (Conflict approach) খ. সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভঙ্গি (Compatibility approach) এবং সংশয়বাদী মনোভঙ্গি (Skeptical approach)।

ক. দ্বান্দ্বিক মনোভঙ্গি: গণতান্ত্রিক সরকার উন্নয়নে বাধা দেয় এ ধারণার উপর ভিত্তি করে দ্বান্দ্বিক মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছে। এ মনোভঙ্গিতে বলা হয়েছে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রয়োজন। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে অধিক ক্ষমতা আরোপ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। কারণ তারা সহজেই সঞ্চয় বৃদ্ধিতে চাপ প্রয়োগ করতে পারে, অধিক কর আদায় করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে নীতি তৈরি করে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারে (Karakayalı & Yanıkkkaya, 2006; Bhagwati, 2002)। এ মনোভঙ্গি অনুযায়ী উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর পরে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা উচিত বলে মনে করা হয় (Karış, 2020)।

খ. সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভঙ্গি: সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভঙ্গি রাজনৈতিক বহুত্ববাদ, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় যাতে করে কর্তৃত্ববাদী শাসনের পদ্ধতিগত লুণ্ঠন প্রতিরোধ করা যায় (Narayan & Smith, 2011)। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বহুদলীয় নির্বাচন, আইনের শাসন, মানবাধিকারের সুরক্ষা এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ যা

গণতন্ত্রের ফলে অর্জিত হয় সেসব অনুসঙ্গ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। গণতন্ত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে যা স্থিতিশীল বিনিয়োগ এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে (Adejumobi, 2000)। সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভঙ্গির অন্যতম গবেষক Mancur Oslan (1993) তাঁর "Rise and Fall of Nations" শীর্ষক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের চেয়ে গণতান্ত্রিক শাসন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত (Olson, 1993)। গণতন্ত্র ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক- এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভঙ্গির মূল কথা। গণতান্ত্রিক শাসন দীর্ঘমেয়াদে টেকসই, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুষম উন্নয়নের পথ করে দেয় (Sirowy and Inkeles, 1990)।

গ. সংশয়বাদী মনোভঙ্গি: সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পদ্ধতিগত সম্পর্ক নেই বলে মনে করা হয়। সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, যেহেতু উন্নয়ন অনেক বিষয়ের প্রভাব থাকে সেহেতু গণতন্ত্র উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সীমিত প্রভাব ফেলে বলে মনে করা হয় সংশয়বাদী মনোভঙ্গিতে।

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন আন্তঃসম্পর্কিত- বিষয়টি বেশিরভাগ প্রধান্যশীল গবেষণায় প্রমাণিত। গণতন্ত্র না থাকলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়, আবার উন্নয়নে গতিশীলতা না থাকলে গণতন্ত্রও পরাহত হয়। কেননা, "The effectiveness of institutions and the soundness of democracy politics are acknowledged as catalysts for development (UN, 2013)।" বিভিন্ন উন্নয়ন সাহিত্যে বলা হয়েছে গণতন্ত্র উন্নয়নের সূচক; যেমন: স্বাক্ষরতা, গড় আয়ূ, প্রবৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা, এবং জীবনের অন্যান্য স্তর বৃদ্ধি করে (Dambula, 2022)। বেশিরভাগ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ বিশ্বাস করেন যে 'গণতন্ত্র মানব উন্নয়নকে সমৃদ্ধ করারও অন্যতম কার্যকরী পথ (UNDP, 2002-2006)।'

যেসব দেশে দূর্বল গণতন্ত্র ও আইনের শাসন এবং দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয় সেসব দেশে গৃহযুদ্ধের আশংকা থাকে ৩০-৩৫ শতাংশ (Rabbit, 2017)। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের পর সামরিক, আধা-সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘ সময় বলবৎ থাকায় গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিশ্বব্যাংকের তথ্য বিশ্লেষণ করে Uddin & Laila (2010) দেখিয়েছেন যে ১৯৯০-এর দশকে গণতান্ত্রিক শাসনামলে বাংলাদেশের উন্নয়ন সক্ষমতা ১৯৮০-এর দশকের সামরিক কর্তৃত্ববাদী শাসনামলের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের সামরিক-কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলোর থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয়, দারিদ্র দূরীকরণ, মানব উন্নয়নসহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর অর্জন তুলনামূলকভাবে বেশি (Uddin & Laila, 2010)।

শেখ হাসিনার স্বদেশে ফিরে গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের দেয়াল তৈরি করেছেন যা দেশি-বিদেশি অগণতান্ত্রিক শক্তি বা চক্রান্ত দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব নয়। বর্তমান নিবন্ধের তত্ত্ব ও তথ্য অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এসবই প্রমাণ করে।

১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড পরবর্তী শেখ হাসিনার অবস্থা ও অবস্থান (১৯৭৫-১৯৮১)

বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম জঘন্যতম রক্তপাত ঘটে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫। এইদিন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে ঢাকা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শেখ হাসিনা, তাঁর দুই সন্তান সজীব আহমেদ ওয়াজেদ জয় ও কন্যা সায়মা হোসেন ওয়াজেদ (পুতুল) এবং তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানা বেলজিমায়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান।

শেখ হাসিনার সহধর্মী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া ১৩ মার্চ ১৯৭৫ পশ্চিম জার্মানির কার্লসরুয়ে পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্রে পোস্টডক্টরাল গবেষক হিসেবে আসেন। ৩০ জুলাই ১৯৭৫ শেখ হাসিনা তাঁর দুই সন্তান এবং বোনকে নিয়ে কার্লসরুয়ে আসেন ড. ওয়াজেদ মিয়ার নিকট (হোসেন, ২০২১)। ১০ দিন কার্লসরুয়ে থাকার পর ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তাঁরা পশ্চিম জার্মানির বন শহরে এসে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর বাড়িতে ১১ আগস্ট পর্যন্ত অবস্থান করেন। ১২ আগস্ট রাতে বন থেকে সড়কপথে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের বাসভবনে অবস্থান করেন। ১৩ আগস্ট রাতে নেদারল্যান্ডেসের শহর আমস্টারডামে অবস্থান করে ১৪ আগস্ট সানাউল হকের বাসায় ফিরে যান (আহমেদ, ২০২১)। ১৫ আগস্ট সানাউল হক-এর বাসা থেকে প্যারিস ভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে ওইসময়ের রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী গাড়ি পাঠিয়ে ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় তাঁদেরক তাঁর জার্মানির বাসায় নিয়ে আসেন (চৌধুরী, ২০২২)।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ রাত ১১টার পর হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী জার্মানীতে তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসায় ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়াকে নিয়ে যান। এসময় ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া তাদের নিরাপত্তার জন্য ভারত সরকারের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় চান। এরপর ১৮ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে বন থেকে শেখ হাসিনাসহ সকলে কার্লসরুয়ে গেস্টহাউসে দু'টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে ওঠেন (মিয়া, ২০২২)। কার্লসরুয়ে থেকে ২৪ আগস্ট সকাল ৯টার দিকে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা তাঁদের ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে নিয়ে যান। ২৫ আগস্ট সকাল ৮টার দিকে তাঁরা এয়ার ইন্ডিয়ার একটি জাম্বো বিমানে (পশ্চিম) জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দিল্লিস্থ পালাম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন (মিয়া, ২০২২)। দুপুর ১টায় ভারতীয় দুই কর্মকর্তা বিমানবন্দর থেকে নয়াদিল্লির ডিফেন্স কলোনির একটি বাসায় নিয়ে যান তাঁদের। ২৬ আগস্ট ওই কর্মকর্তাদ্বয় আবার বাসায় আসেন এবং বাসার বাইরে না যাওয়া এবং কারও সঙ্গে যোগাযোগ না করার পরামর্শ দেন (মিয়া, ২০২২)। এরপর কোন একদিন রাত ৮টায় গাড়িতে ভারতীয় এক কমর্কর্তা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে নিয়ে যান শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়াকে। ইন্দিরা গান্ধী সেখানে উপস্থিত ওই কর্মকর্তাকে ১৫ আগস্টের ঘটনা সম্পর্কে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য জানাতে বলেন। ওই কর্মকর্তা জানান যে, বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কেউই বেঁচে নেই (মিয়া, ২০২২)। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নয়াদিল্লিস্থ ভারতীয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ 'ইন্ডিয়া-গেট'-এর নিকটবর্তী পান্ডারা রোডস্থ সরকারি দোতলা বাড়ির উপরতলার দুটি শয়নকক্ষ-বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট তাঁদের থাকার জন্য দেওয়া হয় (মিয়া, ২০২২)।

ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হলে (১৯৭৭) দিল্লিতে শেখ হাসিনার সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে তিনি আবার ক্ষমতায় আসলে শেখ হাসিনার সুযোগ-সুবিধার দুশ্চিন্তা শেষ হয় (আহমেদ, ২০২১)। ২৪ জুলাই ১৯৭৬ শেখ রেহানার বিয়ে হয় লন্ডনপ্রবাসী শফিক সিদ্দিকীর সঙ্গে। ওই বিয়েতে শেখ হাসিনা ও ওয়াজেদ মিয়া অংশ নিতে পারেননি আর্থিক কারণে (বিবিসি বাংলা, ২০১৭)। তবে ৪ এপ্রিল ১৯৮০ শেখ হাসিনা দিল্লি থেকে লন্ডনে গিয়েছিলেন রেহানার সঙ্গে থাকতে এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড পরবর্তী সামারিকতন্ত্রে পদপিষ্ট গণতন্ত্র

১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যাই নয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম এবং সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন, রাজনীতি-গণতন্ত্র, সংবিধানকেও হত্যা করা হয়। "বঙ্গবন্ধুকে হত্যার নেপথ্যে শুধু ব্যক্তি মুজিবকে নয়, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটাকেও হত্যা করা হয়েছিল (ওয়াজেদ, ২০২২)।" বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার নথিপত্রে জানা যায় যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা, নতুন সরকার গঠন এবং বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি একই সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল ঢাকা সেনানিবাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ভোর ৩টার দিকে (উদ্ধৃত: Liton, 2016)। "কতিপয় বিভ্রান্তকারী সামরিক কর্মকর্তারা অকস্মাৎ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে–বিষয়টি তা নয়, বরং তা ছিল এর তুলনায় বহুগুণ বেশি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (হারুন, ২০২২)।" এই হত্যাকান্ডের মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাদেশের পশ্চাৎ-মুখী যাত্রা। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র একাত্তর পূর্ববর্তী অবস্থায় নিয়ে যায় দেশকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্রিক নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে নিজ দলের লোকদের দুর্নীতিতে বঙ্গবন্ধু হতবিহব্বল হয়ে পড়েন। তিনি দুর্নীতির অভিযোগে নিজ দলের কিছু সাংসদকে বহিষ্কারও করেন। সাড়ে তিন বছরের বৈরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪ রাষ্ট্রপতিকে বঙ্গবন্ধু অনুরোধ করেন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে। "দুর্ভিক্ষে এত মানুষের মৃত্যু তাঁকে বিমর্ষ ও ডেসপারেট করে তুলেছিল। এতো নাশকতা, এতো বৈরিতা, এতো দুর্নীতি এক সময় তাকে বাধ্য করেছে নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিতে, বাকশাল গঠন করতে (মোহাম্মদ, ২০০৩)।" এজন্যইতো ২৬ মার্চ ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু জীবনের শেষ জনসভায় বলেছিলেন, "আমি পাকিস্তানিদের যে আঘাত করেছিলাম, তার চেয়েও আরও বড়ো ধরনের আঘাত হানতে চাই বর্তমান ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে (সুজাত, ২০১৭)।"

বাংলাদেশের সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫। ওইদিন নতুন প্লাটফর্ম বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) সংবিধানে অর্ন্তভুক্ত হয়। এটা ছিল সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর সাময়িক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দর্শন বা 'মুজিববাদ'। এদিন সংসদে বঙ্গবন্ধু বলেন: "...দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড রেভলিউশন। এই

রেভলিউশন-এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো (মুকুল, ১৯৭৯)।" তিনি বলেন, "আজকে এ্যামেন্ডেড কনষ্টিটিউশনে যে নতুন সিষ্টেমে আমরা যাচ্ছি তাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই (মুকুল, ১৯৭৯)।" এই শোষিতের গণতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয় সেজন্যই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।

১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড দেশকে পিছিয়ে দেয়। একের পর এক ক্যু হতে থাকে, চলতে থাকে সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন। "এরপর বাংলাদেশে ১৯টি সামরিক ক্যু হয়েছে। বারবার অশান্ত পরিবেশ, কত হাজার হাজার সামরিক বাহিনীর সৈনিক, অফিসার এবং মানুষকে হত্যা করা হয়েছে (হাসিনা, ২০২১)।" ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এভাবেই চলে দেশ।

সারণী-১: বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর লুণ্ঠিত গণতন্ত্র ও মন্থর উন্নয়ন (১৯৭৫-১৯৮৯)

লুণ্ঠিত গণতন্ত্র	লুণ্ঠিত গণতন্ত্র
▪ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন। ▪ গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক জান্তার শাসন। ▪ মৌলিক অধিকার হরণ। ভোট ও ভাতের অধিকার সেনা ছাউনিতে বন্দি। ▪ সামাজিক ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে শাসকগোষ্ঠী ভোগবিলাস ও মাদকাসক্ত উচ্চ শ্রেণির সৃষ্টি করে অবাধ শোষণ। ▪ গণতন্ত্রের পরিবর্তে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম।	▪ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুটেরা গোষ্ঠী সৃষ্টি। ▪ দুঃশাসনে দুর্নীতি ও চোরাচালানে ভরপুর দেশ। ▪ ৯০ শতাংশ মানুষের দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস। ▪ বঙ্গবন্ধুর আমলে শিক্ষার হার ২৬ শতাংশ থেকে কমে হলো ১৫ শতাংশ (১৯৮৯)। ▪ ভূমিহীনদের সংখ্যা ৩৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হলো ৭০ শতাংশ (১৯৮৯)। ▪ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক মওকুফ প্রথা উঠিয়ে দিয়ে খাজনা বৃদ্ধি। ▪ দেশে বিদেশি পণ্যে ছেয়ে যাওয়ায় দেশি পণ্য বিক্রির হার নিম্নগামী। ▪ বঙ্গবন্ধুর আমলে নিষিদ্ধ হওয়া মদ-জুয়া গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেল। ▪ বেকার সমস্যা বৃদ্ধি। ▪ অনুৎপাদনশীল খাতে বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমে গেল। ▪ দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে জনজীবন অতিষ্ঠ হলো। হাজার হাজার মানুষ অপুষ্টিতে ভুগতে থাকল। শিশুরা বিকলাঙ্গ হলো।

উৎস: হাসিনা (২০২১)।[২]

[২]এই সারণীটি গবেষক তৈরি করেছেন শেখ হাসিনা কর্তৃক ১৫ আগস্ট ১৯৭৯ সালে লিখিত "ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ড" প্রবন্ধ থেকে (হাসিনা, ২০২১)। এই প্রবন্ধ থেকে তথ্য নিয়ে 'লুণ্ঠিত গণতন্ত্র' ও 'মন্থর উন্নয়ন' কলামে সারণীবদ্ধ করা হয়েছে ওই সময়কার গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চিত্র উপস্থাপন করতে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খন্দকার মোশতাক আহমেদ নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। মোশতাক ১৫ আগস্ট হত্যাকারীদের জাতির 'সূর্যসন্তান' বলে আখ্যা দেন। ২০ আগস্ট ১৯৭৫ মোশতাক সামরিক আইন জারি করে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করেন।

মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক' বইতে লিখেছেন, "ক্ষমতায় এসেই এই সরকার তাড়াহুড়ো করে সামরিক বাহিনীতে পরিবর্তন আনে। জেনারেল ওসমানীকে (এমএজি ওসমানী) একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির সামরিক উপদেষ্টা করা হলো। উপ-সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হলো [২৪ আগস্ট ১৯৭৫]। আর পূর্বতন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে অব্যাহতি দিয়ে তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হলো রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগের জন্য।"

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার যাতে না করা যায় ২৬শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদ ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেন। জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মোঃ মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে কারাগারে পাঠান। ৩রা নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে এই জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। ওইদিনই খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থান হলে ৬ই নভেম্বর মোশতাক পদত্যাগ করেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম নতুন রাষ্ট্রপতি হন। জিয়াকেও সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং তাকে ঢাকা সেনানিবাসের বাসভবনে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ৭ নভেম্বর জিয়ার ইন্ধনে পাল্টা অভূত্থান হয়। জিয়া মুক্ত হয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসেন।

১৯ নভেম্বর ১৯৭৬ জিয়াকে পুনরায় সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। বেতারে ভাষণে জিয়া নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। ২১ এপ্রিল ১৯৭৭ রাষ্ট্রপতি আবু সাদত মো. সায়েমকে হটিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন জিয়া। ১৯৭৭ সালের ১ নং প্রক্লেমেশন জারি করে সংবিধানের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতার কারণে নিষিদ্ধ মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পিডিবি ও নেজামে ইসলাম রাজনীতি করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে নির্যাতন ও গ্রেফতার করে দমন করা হয় আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষশক্তিকে। জিয়ার আদেশে গণ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় সেনানিবাসে। ২ অক্টোবর ১৯৭৭ সালের পর শত শত সেনা সদস্যকে সামরিক বিদ্রোহের অভিযোগে সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচারের নামে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (N. M. J., 1978)। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৮ জিয়া এক ফরমান জারি করে সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে নিজের হাতে কুক্ষিগত করেন।

তিনি একাধারে রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও সেনাবাহিনীর প্রধানের পদে থেকে ৩ জুন ১৯৭৮ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজন করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অধ্যাদেশ ১৯৭৮ অনুযায়ী কোনো সরকারি চাকরিজীবী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ না থাকলেও জিয়া রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ছিলেন। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ জিয়া বিএনপি প্রতিষ্ঠা

করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে তার দল বিএনপি ২০৭টি আসনে বিজয়ী হয়। বিএনপির মনোনয়নে অনেক দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধীকে জাতীয় সংসদে আনা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করার পরিবর্তে জিয়ার নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ৪ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখ এ হত্যাকাণ্ডকে "একটি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফল" বলা হয়। জিয়ার নেতৃত্বাধীন সংসদের শোক প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুকে 'সাবেক রাষ্ট্রপতি' হিসেবে উল্লেখ করা হয় (উদ্ধৃত: Liton, 2016)। অথচ ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাষ্ট্রপতি। ওই অধিবেশনেই সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী প্রস্তাব করে বিএনপি। মোশতাকের জারিকৃত "দায়মুক্তি অধ্যাদেশ" পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়।

দ্বিতীয় সংসদ যাত্রা শুরু করে তখন দেশে সামরিক শাসন বিরাজ করছিলো। এমনকি, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে বিজয়ী সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানোর জন্য স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার ছিল না। প্রধান সামরিক কর্মকর্তা রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সংসদ সদস্যদেরকে শপথ পড়ান এবং প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

জিয়াউর রহমান ৩০ মে ১৯৮১ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল কর্মকর্তা কর্তৃক নিহত হন। জিয়া হত্যাকাণ্ডের পরে বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পান। তিনি ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হন। ২৪ মার্চ ১৯৮২ এরশাদ কর্তৃক সংঘটিত এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে অপসারিত হন সাত্তার। এরশাদ আব্দুস সাত্তারের সরকারকে হটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে এরশাদ দেশ পরিচালনা করেন সামরিক একনায়কতান্ত্রিক কাঠামোয়।

এরশাদবিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে আসলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন আট দল, বিএনপি নেতৃত্বাধীন সাত দল এবং বামপন্থিদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ দল মিলে এরশাদ-পরবর্তী সরকারব্যবস্থা কী হবে- তার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে ১৯ নভেম্বর ১৯৯০। এটা তিন জোটের রূপরেখা নামে পরিচিত। গণআন্দোলনের মুখে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯০ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ।

আওয়ামী লীগ প্রথম, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। বিএনপি দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম সংসদ নির্বাচনে এবং জাতীয় পার্টি তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। প্রতিটি সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর করে হলেও ১১টি নির্বাচনের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পাঁচটি সংসদ তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি।

১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশে বারবার সামরিক আইন জারি, অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল, সংবিধান লঙ্ঘন ও সংশোধন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ করায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দূর্বল হয়। মার্শাল'ল প্রোক্লেমেশন এবং সংবিধানের ৫ম, ৭ম, ৮ম, ৯ম সংশোধনীর ফলে সংবিধান ক্ষত-বিক্ষত হয় এবং শাসন ব্যবস্থার সামরিকীকরণ ঘটে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও গণতান্ত্রিক মুক্তির আন্দোলন

শেখ হাসিনার দীর্ঘসময় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করার সুয়োগ হয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেও ছাত্রজীবনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। সরকারি ইন্টামেডিয়েট গার্লস কলেজের ছাত্রী সংসদের নির্বাচিত (বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রার্থী হিসেবে) সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। তিনি এই কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরের বছর সভাপতি ছিলেন। শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একজন সদস্য এবং ছাত্রলীগের রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই শেখ হাসিনা সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। "উন-সত্তরের ২৪শে জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থানের পর ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত নেপথ্য নায়ক নয়, হাসিনা প্রকাশ্যই আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন (লেলিন, ২০১৯)।" "স্বাধিকার আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে শেখ হাসিনার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি পাশে থেকে পিতাকে সাহায্য করেছেন। ... উত্তরাধিকার সূত্রেই তিনি পেয়েছেন সাহস, ধৈর্য্য ও দেশমাতৃকার জন্য পিতার মতো অন্ধ ভালোবাসা (লেলিন, ২০১৯)।" শেখ হাসিনা রাজনৈতিক ও গণতন্ত্রিক অধিকার আদায়ের চর্চা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন ছাত্রজীবনেই।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ শেখ হাসিনা রাজনৈতিক আশ্রয়ে ছয় বছর ভারতে অবস্থান করেন। ১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ অনুষ্ঠিত সম্মলনে শেখ হাসিনার অনুস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। শেখ হাসিনা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেনঃ "আমার অবর্তমানে আওয়ামী লীগ যখন আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করল তখন সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আসব (উদ্ধৃত: আহমেদ, ২০২১)।" তিনি বলেন তখন আওয়ামী লীগ বিভক্ত ছিল। তিনি বাংলাদেশে চিঠি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বলতেন (প্রথম আলো, ২০১৪)। তবে দেশে আসার জন্য ব্যাকুল থাকতেন তিনি। ১৭ জানুয়ারি ১৯৭৬ এক চিঠিতে লেখেন: "...বিদেশ আর ভালো লাগে না। দোয়া করবেন যেন তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।" বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নেন।

নির্বাসনকালীন লন্ডনে গিয়ে শেখ হাসিনা রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হতে থাকেন। ছোটবোন শেখ রেহানা বলেনঃ "১৯৮০ সালের ১৬ আগস্ট ইর্য়ক হল-এ ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড সর্ম্পকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আপা তখন লন্ডনে। তিনি সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর লন্ডনে প্রথম রাজনৈতিক সভা (উদ্ধৃত: আহমদ, ২০২১)।"

১৬ মে ১৯৮১ শেখ হাসিনা ও তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল দিল্লি থেকে একটি ফ্লাইটে কলকাতা পৌঁছান। সেখান থেকে তিনি ১৭ মে দেশে ফিরে আসেন। সেদিন বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাজপথে নেমেছিল মানুষের ঢল। পথের দুইধারে মানুষের মিছিল, পথে ট্রাক, গাড়ি, হোন্ডার সারিবদ্ধ শোভাযাত্রা (বেগম, ১৯৮১)।

বিমানবন্দর থেকে মানিক মিয়া এভিনিউতে এক সমাবেশে শেখ হাসিনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে

বলেনঃ "... পিতা-মাতা-ভাই সবাইকে হারিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি আপনাদের মাঝেই তাদের ফিরে পেতে চাই। আপনাদের নিয়েই আমি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে তা বাস্তবায়ন করে বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চাই, বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক মুক্তি ছিনিয়ে আনতে চাই (আহমেদ, ২০২১)।"

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শেখ হাসিনাকে তাঁদের ৩২ নম্বরের বাড়িতে ঢুকতে দেননি। ১২ জুন ১৯৮১ পর্যন্ত ওই বাড়িতে আওয়ামী লীগের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ৩০ মে ১৯৮১ জিয়া নিহত হওয়ার পর ২২ জুন বাড়িটি শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয় (আহমেদ, ২০২১)।

১৯৮১ সালে দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হন শেখ হাসিনা। এজন্য তিনি শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন। তাঁকে বারবার কারান্তরীণ করা হয়। তাঁকে হত্যার জন্য কমপক্ষে ১৯ বার সশস্ত্র হামলা করা হয় (সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ২০২২)।

সারণী-২: গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করতে শেখ হাসিনার উপর নির্যাতনের চিত্র (১৯৮৩-২০০৭)

ঘটনার সময়	ঘটনার ধরন	অন্যান্য তথ্য	শাসনকাল
১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩	আটক ১৫ দিন		এরশাদ
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪	গৃহবন্দি দুইবার		এরশাদ
২ মার্চ ১৯৮৫	আটক ও গৃহবন্দি ৩ মাস		এরশাদ
১৫ অক্টোবর ১৯৮৬	গৃহবন্দি ১৫ দিন		এরশাদ
১০ নভেম্বর ১৯৮৭	পুলিশের গুলিবর্ষণ; জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তাঁকেসহ তাঁর গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্ট।	সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি। গুলিতে যুবলীগ নেতা নূর হোসেন, বাবুল ও ফাত্তাহ নিহত হন।	এরশাদ
১১ নভেম্বর ১৯৮৭	গ্রেফতার ও অন্তরীণ ১ মাস		এরশাদ
২৪ জানুয়ারি ১৯৮৮	চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলি; লালদীঘি ময়দানে ভাষণদানকালে লক্ষ্য করে ২বার গুলি; জনসভা শেষে ফেরার পথে গাড়ি লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি।	শেখ হাসিনা অক্ষত থাকলেও ৩০ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী নিহত হন।	এরশাদ
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯	গ্রেফতার ও গৃহবন্দি		এরশাদ
২৭ নভেম্বর ১৯৯০	বঙ্গবন্ধু ভবনে অন্তরীণ		এরশাদ
১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯১	জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন চলাকালে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ	অক্ষত	খালেদা জিয়া
১৯৯৪	ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে শেখ হাসিনার কামরা লক্ষ করে অবিরাম গুলিবর্ষণ	অক্ষত	খালেদা জিয়া
২০ ও ২১ জুলাই ২০০০	গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় হেলিপ্যাডে এবং তাঁর জনসভাস্থলে ৭৬ কেজি ও ৮৪ কেজি ওজনের পুতে রাখা দু'টি বোমা উদ্ধার	শেখ হাসিনা পৌঁছার পূর্বেই বোমাগুলো সনাক্ত হওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান।	খালেদা জিয়া

ঘটনার সময়	ঘটনার ধরন	অন্যান্য তথ্য	শাসনকাল
২১ আগস্ট ২০০৪	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ জনসভায় বক্তব্য শেষ করার পরপরই তাঁকে লক্ষ্য করে এক ডজনেরও বেশি আর্জেস গ্রেনেড ছোঁড়া হয়।	শেখ হাসিনা প্রাণে রক্ষা পেলেও আইভি রহমানসহ তাঁর দলের ২২ নেতাকর্মী নিহত হন এবং ৫ শ'র বেশি মানুষ আহত হন। শেখ হাসিনা নিজেও কানে আঘাত পান।	খালেদার জিয়া
১৬ জুলাই ২০০৭	মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার ও সংসদ ভবন চত্বর সাবজেলে ১০ মাস ২৬ দিন বন্দি	১১ জুন ২০০৮ মুক্তিলাভ	সেনা সমর্থিত তত্ত্বধায়ক সরকার

উৎস: সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ-এর ওয়েবসাইট https://afd.portal.gov.bd থেকে সংগৃহীত। সংগ্রহের তারিখঃ ২২ মে ২০২২

এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। এর আগে মোশতাক ও জিয়া অবৈধভাবে ক্ষমতা ভোগ করে গেছেন। এরশাদ ক্ষমতায় এসেই সংবিধান স্থগিত করেন, মন্ত্রিসভা ও সংসদ বাতিল করেন, এবং নিষিদ্ধ করেন সব রাজনৈতিক কর্মকান্ড। ঢাকায় জারি করেন সান্ধ্য আইন। এরশাদ ও জিয়া আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের মতো একই কায়দায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।

৭ মে ১৯৮৬ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ও সমমনা কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ও সাত দলীয় জোট নির্বাচন বয়কট করে। জাতীয় পার্টি সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জনে ব্যর্থ হয়। এরশাদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বুঝতে পেরে আওয়ামী লীগ আন্দোলন আরো বেগবান করে।

দীর্ঘ আট বছরের (১৯৮২-৯০) ছাত্র-জনতা-পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের আন্দোলনের ফলে এরশাদ সরকারের পতন হয়। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দল ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন সাত দল। পরে ১৫ দল ভেঙে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন আট দল ও বামপন্থীদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ দল গঠিত হয়। তিনটি জোট -- আট দল, পাঁচ দল ও সাত দল--যুগপৎ আন্দোলনে এরশাদকে পদত্যাগে বাধ্য করে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০। উল্লেখ্য যে, তিন জোটের পাশাপাশি জামায়াতও তাদের পুনর্বাসনের কৌশল হিসেবে এই আন্দোলনে আলাদাভাবে শরিক হয়েছিল। এরশাদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সংসদ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন।

প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন এবং দীর্ঘদিন পর সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু হয়। এই নির্বাচনে ৮ দলীয় জোটের নির্বাচনে নেতৃত্ব দেন শেখ হাসিনা। ৯৪টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ সংসদে প্রধান বিরোধী দল হয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা আবারও চালু হওয়ার পর থেকে মোটামুটি

স্থিতিশীলভাবেই চলছিল রাজনীতি। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় ২০ মার্চ ১৯৯৪ অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হলে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি সরকারের অধীনে সকল নির্বাচন বর্জন করেন। পরবর্তী ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজনের দাবি বিএনপি সরকার গ্রহণ না করলে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টির ১৪৭ জন সংসদ সদস্য ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করে তীব্র আন্দোলন শুরু করে।

তীব্র আন্দোলন, সংঘাত এবং সহিংসতার মধ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ একতরফা ভোটারবিহীন ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করে বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার। এ নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। অসহযোগ আন্দোলনের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। ২৬ মার্চ সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়। ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন এবং খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেতে বাধ্য হন।

শেখ হাসিনা আবারও প্রমাণ করেন জনগণই রাজনীতির মূল শক্তি ও সংসদীয় গণতন্ত্রই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার প্রাণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ জুন ১৯৯৬ এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করে সরকার।

১ অক্টোবর ২০০১ অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিচারপতি লতিফুর রহমান নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। নির্বাচনে বিএনপি ১৯৩ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। কিন্তু আবারো শেখ হাসিনাকে সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। কেননা, বিএনপি-জামায়াত সরকারের মেয়াদ ২৭ অক্টোবর ২০০৬ শেষ হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্ব নেওয়ার কথা সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির। উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিচারপতিদের অবসরে যাওয়ার বয়স দুই বছর বৃদ্ধি করা হয় যাতে করে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে কেএম হাসান অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে পারেন। কেএম হাসান হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে বিএনপি'র অনুসারী ছিলেন। কেএম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আওয়ামী লীগের মেনে নিতে নারাজ ছিল। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের আন্দোলন অব্যাহত রাখে। আন্দোলনের মঝে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ২৯ অক্টোবর ২০০৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন। শেখ হাসিনা ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও মেনে না নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান। দেশে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হলে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দেন। ফখরুদ্দীন আহমেদকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। ১২ জানুয়ারি ২০০৭ ফখরুদ্দীন আহমেদ শপথ নেন এবং তিনি ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। সেনা সমর্থিত তত্ত্ববাবধায়ক সরকার দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের নামে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। 'মাইনাস-টু-ফর্মুলা' গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করে

তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে।

শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই ২০০৭ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হন। গ্রেপ্তারের আগে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে যান। ওই চিঠিটি নেতাকর্মীদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করে। গণতন্ত্র অবরুদ্ধ হওয়ায় দুঃসময়ে নেতাকর্মীরা কী করবেন তার নির্দেশনা দেন ওই চিঠিতে। চিঠিটি হুবহু নিচে দেওয়া হলো।

প্রিয় দেশবাসী

আমার সালাম নিবেন। আমাকে সরকার গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় জানি না। আমি আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই সারাজীবন সংগ্রাম করেছি। জীবনে কোনো অন্যায় করিনি। তারপরও মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও আপনারা দেশবাসী আপনাদের ওপর আমার ভরসা। আমার প্রিয় দেশবাসী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের কাছে আবেদন- কখনো মনোবল হারাবেন না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন। যে যেভাবে আছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। মাথা নত করবেন না। সত্যের জয় হবেই। আমি আছি আপনাদের সঙ্গে, আমৃত্যু থাকব। আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, আপনারা বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান। জয় জনগণের হবেই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়বই। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবই।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

শেখ হাসিনা
১৬.০৭.২০০৭

অবশেষে ১১ জুন ২০০৮ শেখ হাসিনা মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি ও শক্তি পায় দেশের গণতন্ত্র। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট জয়লাভ করে ২৩০টি আসন, বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট পায় ৩০টি আসন, এবং জাতীয় পার্টি ২৭টি আসন। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন সংগ্রাম করে বাঙালী জাতিসত্তার পরিচয় এনে দিয়েছেন এবং দেশকে স্বাধীন করেছেন এবং তার কন্যা শেখ হাসিনা শত বাধা-বিপত্তি এবং হত্যার হুমকিসহ সহস্র প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন না করলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও গণতন্ত্রের

ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখতে হতো। ভিন্ন ইতিহাসে সামরিকতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্রের আবরণে প্রহসনতন্ত্র বিরাজ করতো যেমনটি বিরাজ করেছে মোশতাক-জিয়া-এরশাদ- খালেদার শাসনামলে।

শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্র ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক

রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে স্তব্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা। নস্যাৎ হয়ে যায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্জনগুলো। একের পর এক সামরিক ক্যু, হত্যা, ষড়যন্ত্র, লুটপাট বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয় সামরিক শাসকগণ।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরেছেন গণতন্ত্রের জাগরণে সংগ্রাম করেছেন, কখনও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে, কখনও সরকার কাঠামোয় নেতৃত্ব দিয়ে। তিনি একদিকে গণতন্ত্রকে সমুন্নত করেছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশকে রোল মডেল হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে। শেখ হাসিনা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে প্রথমবার, ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে দ্বিতীয়বার এবং ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ৭ জানুয়ারি ২০১৯ শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর আগে শেখ হাসিনা চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। শেখ হাসিনা দেশে প্রত্যাবর্তন করায় এসব সম্ভব হয়েছে।

শেখ হাসিনার শাসনামলে আর্থ-সামাজিক খাতে দেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে তাঁর সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো: ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা নদীর পানি চুক্তি সম্পাদন; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি; বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ এবং খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন। তিনি ভূমিহীন ও কৃষকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মধ্যে দুস্থ নারী, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতা, বয়স্কদের জন্য নিবাস, এবং আশ্রয়ণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

২০০৯-২০১৩ মেয়াদে অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,২৬০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ; গড়ে ৬ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন, ৫ কোটি জনগণকে মধ্যবিত্তে উন্নীতকরণ; ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সামুদ্রিক জলসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি; প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন; মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কৃষকদের জন্য কৃষিকার্ড ও ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার বিধান, বর্গাচাষীদের জামানতহীন ঋণ প্রদান, প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দারিদ্র্যের হার ৩৮.৪ (২০০৬ সাল) থেকে ২০১৩-১৪ বছরে ২৪.৩ শতাংশে হ্রাস প্রভৃতি।

২০১৪-২০১৮ মেয়াদে উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো: বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ; ভারতের সাথে ৬৮ বছরের সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি, মাথাপিছু আয় ১,৬০২ ডলারে উন্নীতকরণ, দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে হ্রাস, ৩২ বিলিয়ন ডলারের উপর বৈদেশিক

মুদ্রার রিজার্ভ, পদ্মা সেতুর কাজ শুরু, এবং মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ প্রভৃতি।

চতুর্থ মেয়াদে (২০১৯-২০২৩-চলমান) এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে অর্ন্তভুক্তিকরণ, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ এবং ঢাকায় মেট্রোরেল স্থাপন, এবং রাজধানী ঢাকার সঙ্গে বেশ কয়েকটি জেলার সংযোগ সড়ক চার-লেনে উন্নীতকরণ। রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ, মাতারবাড়ি বহুমুখী প্রকল্পসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন। এছাড়া সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মিত হচ্ছে। সকল বিভাগে আইসিটি পার্ক নির্মাণের কাজ চলছে। মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

সারণী ৩: বিএনপি-জামায়াত সরকার (২০০৫-০৬) এবং আওয়ামী লীগ সরকারের (২০১৮-১৯)

তুলনামূলক উন্নয়ন চিত্র

ক্রমিক	সূচক	২০০৫-০৬ অর্থবছর (বিএনপি-জামায়াত সরকার)	২০১৮-১৯ অর্থবছর (আওয়ামী লীগ সরকার)
১	মাথাপিছু আয়	৫৪৩ ইউএস ডলার	১,৭৫১ ইউএস ডলার
২	দারিদ্র	৪১.৫%	২১.৮%
৩	প্রবৃদ্ধির হার	৫.৪০%	৭.৮৬%
৪	ওপ্তানি	১০.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার	৩৬.৬৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার
৫	জিডিপি'র আকার	৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা	প্রায় ২০ লাখ কোটি টাকা
৬	রিজার্ভ	৩.৪৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার	৩৩.৫৯ ইউএস ডলার (সর্বোচ্চ)
৭	মুদ্রাস্ফীতি	৭.১৬%	৫.৫১% (জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত)
৮	বৈ. বিনিয়োগ	০.৭৪৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার	প্রায় ৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার
৯	বাজেট	৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা	৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা
১০	এডিপি	১৯ হাজার কোটি টাকা	১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা
১১	বিদ্যুৎ (উৎপাদন ক্ষমতা)	৪৯০০ মেগাওয়াট	২০,০০০ মেগাওয়াট
১২	সামাজিক নিরাপত্তা	৩৭৩ কোটি টাকা	৬৪ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা
১৩	দানাদার শস্য উৎপাদন	১ কোটি ৮০ লাখ মেট্রিক টন	৪.২ কোটি মেট্রিক টন

উৎস: করিম (২০১৮)।

শেখ হাসিনার উন্নয়ন মডেলঃ বিশ্বের সাত'শ কোটি মানুষের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারপ্রস্তাবিত 'শান্তি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন মডেল' জাতিসংঘের ৬৭তম সাধারণ অধিবেশনে সকল সদস্য দেশের সমর্থন পায়। তাঁর মডেলের ভিত্তি হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়ন, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন। শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সাতটি বিষয়। এগুলো হচ্ছে ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য দূরীকরণ, বঞ্চনার লাঘব, সবার জন্য কর্মসংস্থান, ঝরেপড়া মানুষদের

সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন তরান্বিত করা এবং সন্ত্রাসবাদের মূলাৎপাটন। ২২ ডিসেম্বর ২০১১ 'জনগণের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন' শিরোনামে ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

উন্নয়নের রূপকল্পঃ রূপকল্প (vision) অনুয়ায়ী পরিকল্পনা ছাড়া একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জেমস ডেভিড উলফেনসন সমন্বিত উন্নয়ন ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাপ্রোচ (Comprehensive Development Framework Approach) তুলে ধরেন যার মূল শক্তি রূপকল্প। উন্নয়ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী দেশসমূহ দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প বাস্তবায়ন করেছে (World Bank, 2005)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশ পুনর্গঠন করে তাঁর দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। এজন্য তিনি 'বাকশাল' গঠন করেন। কারণ তখনকার প্রেক্ষাপটে দেশকে এগিয়ে নিতে বাকশাল ছিল 'সাময়িক রাজনৈতিক ব্যাবস্থাপত্র'। এর আগে তিনি পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষে ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রণয়ন করেন। এর মুখবন্ধে শেখ মুজিব বলেনঃ "No plan, however well-formulated, can be implemented unless there is a total commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices." প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই প্রথম দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প প্রণয়ন করে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৫ আগস্টের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রনায়কেরা অগণতান্ত্রিক পন্থায় শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার রূপকল্প বাস্তবায়ন করেছেন কিন্তু লক্ষাভিমুখী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। শেখ হাসিনাই প্রথম দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প প্রণয়ন করে বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ২০১০ সালে 'রূপকল্প ২০২১' এবং ২০২০ সালে প্রণয়ন করেন 'রূপকল্প ২০৪১'। এসব রূপকল্পের বাস্তবায়নে 'রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপায়ণ : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০১১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' প্রণয়ন করেন। বস্তুতঃ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষেই শেখ হাসিনা এসব দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প প্রণয়ন করেছেন। শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে বলেনঃ "২০১৯ সালে চতুর্থবারের মত সরকার গঠনের সময় দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তর করতে চাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ আর মিথ নয়। এ স্বপ্ন পূরণের 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে আমরা ২০ বছর মেয়াদী এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি (হাসিনা, ২০২২)।"

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করে এবং মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে (এলডিসি) শ্রেণীভুক্ত হয় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। পরবর্তী ৪০ বছর স্বল্পোন্নত দেশই রয়ে যায়। শেখ হাসিনার 'রূপকল্প ২১' ও ষষ্ঠ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ১ জুলাই ২০১৫ বাংলাদেশ স্বল্পোনন্নত দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। দশকব্যাপী ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভব হয়েছে। এখন তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের

(Graduation)[৩] পথে মানদন্ড অর্জন করেছে যা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিত পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে ১১ নভেম্বর ২০২১। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি মিলবে ২০২৬ সালে বলে প্রক্ষেপণ করা হচ্ছে। 'রূপকল্প ২০২১'-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় 'রূপকল্প ২০৪১' গ্রহণ করা হয়েছে। 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তায়নের মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ-মধ্য আয়ের সোপানে উত্তরণ ঘটানো এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে শেখ হাসিনা নিরালস নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশকে। 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) মেয়াদে অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর ভিত্তিমূলে রয়েছে দুটি প্রধান অভীষ্ট: (ক) ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, (খ) বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা (বাপক, ২০২২)। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ চারটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল। এগুলো হচ্ছে: (১) সুশাসন; (২) গণতন্ত্রায়ণ; (৩) বিকেন্দ্রীকরণ এবং (৪) সক্ষমতা বৃদ্ধি। বস্তুত: এই চারটি ভিত্তির ওপর নির্ভর করবে উন্নত জাতি হিসেবে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা (বাপক, ২০২২)।

২০৩০ সালে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত করতে শেখ হাসিনা সরকার আরেকটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। জলবায়ূ পরিবর্তন ও প্রকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে ২০১৮ সালের অক্টোবরে। শেখ হাসিনা বলেনঃ "আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। ২১০০ সালে বাংলাদেশকে যেভাবে গড়তে চাই সেভাবেই আমরা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি (হাসিনা, ২০১৮)।"

মেগাপ্রকল্প[৪] ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন: বাংলাদেশের মেগাপ্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে শেখ হাসিনার শাসনামলে। গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো হচ্ছে: পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু, রূপসা রেল সেতু, কর্ণফুলী ট্যানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-চট্রগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-চট্রগ্রাম উচ্চগতির রেলওয়ে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলওয়ে লিংক, পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১, এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২।

---

[৩]"Graduation is only a waypoint, not an endpoint. Much more remains to be done, and the UN encourages governments to graduate 'with momentum' so that progress continues well into the future."

[৪]অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক অব মেগাপ্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে অনুয়ায়ী এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা এর বেশি ব্যয়বহুল বড় আকারের প্রকল্পকে মেগাপ্রজেক্ট বলা হয়।

স্বপ্নময় এসব মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়িত হলে অবকাঠামো ও পরিবহণ সংকট অনেকটাই কেটে যাবে এবং অর্থনীতি সুসংহত হবে। টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করবে। ব্যাপক বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান হবে। ইতোমধ্যেই পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মিত হওয়ায় সুফল পাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। শুধু পদ্মা সেতুর মাধ্যমে এক থেকে দেড় শতাংশ প্রবৃদ্ধি বাড়ার প্রাক্কলন করা হয়। আর সব মেগাপ্রকল্প মিলিয়ে দেশের জিডিপিতে প্রায় দুই শতাংশ প্রবৃদ্ধি যোগ হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে লক্ষ্য-২০২৫ সালের মধ্যে ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন সহজ হবে।

এছাড়া মহাসড়কসমূহ চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। গত ১০ বছরে ৩৩০ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণ ও ১১৩৫ কি.মি. সংস্কার করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর অত্যাধুনিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ১৩টিতে শিল্প উৎপাদন শুরু হয়েছে এবং আরও ১৫টি নির্মাণাধীন রয়েছে। বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে ২০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে।

শেখ হাসিনা সরকারের আগের মেয়াদ থেকেই বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন সূচকে এগিয়ে। এভাবে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী ২০ বছর পর বাংলাদেশের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের মাথাপিছু আয়ও বাড়বে।

দশটি বিশেষ উদ্যোগ: তৃতীয় মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। একই সাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোট দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০' অনুযায়ী ২০১৯ সালে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মাতৃমৃত্যুর অনুপাত প্রতি লক্ষে ১৯৪ থেকে ১৬৯-এ হ্রাস পেয়েছে। গড় আয়ু ৭২.৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। বন অধিদপ্তর থেকে ২০২০ সালে প্রকাশিত তথ্য-কণিকা অনুসারে ২০০৫-০৬ সালের শতকরা ৭-৮ ভাগ থেকে সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির বিস্তার দেশের মোট আয়তনের ১৫.৫৮ শতাংশে এ উন্নীত হয়েছে। সামাজিক বনায়ন, সড়ক পার্শ্ববর্তী গৃহস্থালি বৃক্ষরাজি হিসেবে নিয়ে দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশ বৃক্ষাচ্ছাদন রয়েছে।

শেখ হাসিনার উদ্যোগের ফলে আজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ সর্বক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমজিডি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক

সূচকে দেশের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের বদৌলতে।

স্বাধীনতার চার দশক পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে তিনি দেশকে কলঙ্কমুক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার, জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি, আশ্রয়হীন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়দান, ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি, সমুদ্রবক্ষে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্লু-ইকোনমির দিগন্ত উন্মোচন, ফোরজি মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহারসহ আইসিটি খাতে বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজকে বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর সুবিধা আজ শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে তৃতীয় এবং মাছ-মাংস, ডিম, শাক-সবজি উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে প্রথম। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০ অনুসারে লিঙ্গ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম। ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫০ (সামগ্রিক স্কোর ৭২.৬ শতাংশ)। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন উপ-সূচকে বাংলাদেশ স্কোর করেছে ৫৪.৫ শতাংশ (বিশ্বব্যাপী ৭ নম্বরে)। নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'এজেন্ট অফ চেঞ্জ' এবং 'প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। সর্বপরি কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে এবং বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টীকা প্রদান শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় মডেল।

শেখ হাসিনা দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের অদম্য সাহস বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থাকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশ এশিয়ার বাঘ হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক সূচকের সরকারের সাফল্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শেখ হাসিনার বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমজিডি) নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্জিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সরকার কঠোর পরিশ্রম করছে এবং লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথে অগ্রগামী হচ্ছে। ২০০৯-২০১৮ সালের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের জিডিপি'র আকার প্রায় চার গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৪ লাখ ৮২ হাজার কোটি থেকে প্রায় ২০ লাখ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে (করিম, ২০১৮)। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে জিডিপি'র নিরিখে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে ৪২তম এবং ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে ৩২তম। প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস-এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অর্থনীতি ২৩তম স্থান দখল করবে। আর এইচবিএসসি'র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে।

সুপারিশ

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে মধ্যে দারিদ্রমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে উন্নয়নের ধারাবাাহিকা বজায় রাখতে হবে এবং কিছু বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন, বেকারত্ব হ্রাস, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও সংহত করে বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনার' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের রাজনীতে সবচেয়ে বেশি সময় রাষ্ট্রক্ষমতায় শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা স্বনির্ভর অর্থনীতি ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণের সুনিপুন কারিগর। পদ্মা সেতুর মতো মেগাপ্রকল্প বাস্তব রূপদান তারই প্রমাণ। তাঁর সাহসিকতাই এখন সক্ষমতার বাংলাদেশ। তাঁর উন্নয়ন দর্শন বিশ্বে রোল মডেল। করোনা মোকাবেলায়ও মডেল দেশ। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীন উন্নয়নের জনক। কেননা, উন্নয়নে স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতার স্বাদ তিনিই প্রথম বাংলাদেশকে দিয়েছেন পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ করে। তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা ও নির্ভরতা যেমন বেশি, জনগণের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাও বেশি। দীর্ঘসময় আন্দোলন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন আবার দারিদ্রমুক্ত করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ তৈরি করেছেন তাঁর নিজস্ব উন্নয়ন দর্শন (রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১) দিয়ে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৫ সালে তাঁর পিতৃভূমি কেনিয়া সফরকালে সে দেশের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন মডেলকে অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি ভালবাসা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফলে। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা বাংলাদেশকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের দেয়াল তৈরি করেছেন তিনি। দেশি-বিদেশি অগণতান্ত্রিক শক্তি বা চক্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশের এ দেয়াল আর ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব নয়। দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব ও তাঁর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র

আহমেদ, সারাফ (২০২১). ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ড: প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যার দুঃসহ দিন, প্রথমা।

হোসেন, শহীদ (২০২১). দুঃসহ সেই ছয় দিন ও বই প্রসঙ্গ, উদ্ধৃতঃ আহমেদ (২০২১). পূর্বোক্ত।

চৌধুরী, হুমায়ূন রশীদ (২০২২). শেখ হাসিনা যেভাবে জানতে পেরেছিলেন, নিরীক্ষা, সংখ্যা ২৪১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২।

মিয়া, ড. এম. এ. ওয়াজেদ (২০২২). পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট শেখ হাসিনার বিপন্ন দিনগুলো, নিরীক্ষা, সংখ্যা ২৪১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২।

ওয়াজেদ, জাফর (২০২২). বঙ্গবন্ধু হত্যা নিরূপণে তদন্ত, নিরীক্ষা, সংখ্যা ২৪১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২।

বিবিসি বাংলা (২০১৭). যেভাবে কেটেছিল দিল্লিতে শেখ হাসিনার নির্বাসিত জীবনের সেই দিনগুলো, ১১ এপ্রিল ২০১৭।

চ্যানেলআই অনলাইন (২০২০). ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা নেওয়ার কাজ করে মজুরি পেতাম: প্রধানমন্ত্রী, উদ্ধৃত: আহমেদ (২০২১). পূর্বোক্ত।

হাসিনা, শেখ (২০২১). জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান বিজয়ের সূবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ, ১৬ ডিসেম্বর ২০২১।

হাসিনা, শেখ (২০২১). বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ জনক আমার নেতা আমার, চারুলিপি প্রকাশন।

হারুন, অধ্যাপক সামছুল হুদা (২০২২). কালো দিঘল রাত এখনো পোহায়নি, নিরীক্ষা, সংখ্যা ২৪১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২।

মোহাম্মদ, বেলাল (২০০৩). স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, চতুর্থ সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

মনসুর, সুজাত (২০১৭). বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব, ঢাকা: চৈতন্য।

মুকুল, শফিকুল আজিজ (১৯৭৯). বাকশাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু, ঢাকা।

বাগচী, অ্যালভীন দীলিপ, (২০১৯). বাংলার স্থাপতি, ৫ম খন্ড, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা।

হক, মাহামুদুল (২০১৯). বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড পরবর্তী অপপ্রচার: জবাব ও জবানবন্দি, নিরীক্ষা, সংখ্যা ২২৪।

হাসিনা, শেখ (২০১৯). স্বাধীনতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে, ঢাকা, ২৫ মার্চ ২০১৯।

লেলিন, নূহ উল আলম, (২০১৯). শেখ হাসিনা গৌরচন্দ্রিকা, গোপ, রবীন্দ্র (সম্পা.) গ্রন্থ 'মানবতার মা শেখ হাসিনা', বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

প্রথম আলো (২০১৪). 'চোখের জলে প্রধানমন্ত্রীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্মরণ, প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৪।

বেগম, মালেকা (১৯৮১). জনস্রোতে শেখ হাসিনা, সচিত্র সন্ধানী, ২৪ মে ১৯৮১।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (২০২২). মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জীবনী, [Online], Available at https://afd.portal.gov.bd [সংগ্রহ: ২২ মে ২০২২]।

করিম, ইহসানুল (২০১৮). বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ১০ বছর, ঢাকা: জিনিয়াস পাবলিকেশনস।

হাসিনা, শেখ (২০২২). প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী, 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১', সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, মার্চ ২০২২।

বাপক (২০২২). 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১', সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, মার্চ ২০২২।

হাসিনা, শেখ (২০১৮). বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশে, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, অক্টোবর ২০১৮।

Aisen, A. & Veiga, F.J. (2013) 'How does political instability affect economic growth?', European Journal of Political Economy, 29.

Barro, R. J. (1996) 'Democracy and growth', Journal of Economic Growth, 1(1).

Collier, p. & Hoeffler, A. (2009) 'Testing the neocon agenda: democracy in resource-rich societies', European Economic Review, 53(3).

Djezou, W. B. (2014), 'The democracy and economic growth nexus: empirical evidence from Côte d'Ivoire', The European Journal of Comparative Economics, 11(2).

Dambula, Chrispin. (2022). Democracy and Development: A Critical Analysis of the Nexus in Malawi and Rwanda, Europan Journal of Development Studies, Vol 2| Issue 2| March 2022.

Heliwell, J. F. (1994) 'Empirical linkages between Democracy and growth', British Journal of Political Science, 24(2).

Hobbes, T. (1967) Leviathan. Ed. Macpherson, Crawford B. Harmondsworth, UK: Penguin. (original work published in 1651).

Huntington, S. (1968) The political order in changing societies. New Haven, CT: Yale University Press.

Index Mundi (2022). [Online] Avaiable at https://www.indexmundi.com/ facts/topics/infrastructure, [সংগ্রহঃ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২]।

Karakayalı, H. & Yanıkkaya, H. (2006) 'Kurumsal faktörlerin ekonomik büyümeye etkileri', in Aktan, C. C. (eds) Kurumsal iktisat kurallar, kurumlar ve ekonomik gelişme, Ankara, Turkey: SPK, cited in Karış (2020).

Karış, Çiğdem (2020). The Relationship Between Economic Growth and Democracy: A Conceptual Approach, Sosyal Mucit Accademic Review, Vol 1.

Liton, Shakhawat (2016). National Mourning Day today: Shame darker than the night, [Online], Available at www.thedailystar.net/frontpage/shame-darker-the-night- 1270021 [Retrived on 2 August 2022].

UN (2013). Democracy and Development: The Role of the UN, Discussion Paper.

Leblang, D. A. (1996) 'Property rights, democracy and economic growth', Political Research Quarterly, 49(1).

Leblang, D. A. (1997) 'Political democracy and economic growth: pooled cross-sectional and time-series evidence', British Journal of Political Science, 27(3).

Lepset, S. M. (1959) 'Some social requisites of democracy, economic development and political development', American Political Science Review, 53(1).

N. M. J. (1978). Murder in Dacca: Ziaur Rahman's Second Round, Economic and Political Weekly, Vol. 13, No. 12 (Mar. 25, 1978). [Online], Available at https://www.jstor.org/stable/ 4366470 [Retrived on 25.09.2022].

Needler, M. (1967) 'Political development and socieconomic development: the case of Latin America', American political Science Review, 62(1967).

Olson, M. (1982) The rise and decline of nations. New Haven: Yale University Press

Olson, M. (1983) The rise and decline of Nations: economic growth, stagflation and social rigidities. New Haven, CT: Yale University Press.

Olson, M. (1993) 'Dictatorship, democracy, and development', American Political Science Review 87(3).

Przeworski, A., Alvarez, M. E., Chiebub, J. A. and Limongi, F. (2000) Democracy and development: political institutions and well-being in the world, 1950-1990. New York: Cambridge University Press.

Rachdi, H. and Saidi, H. (2015) 'Democracy and economic growth: evidence in MENA countries', Procedia Social and Behavioral Sciences, 191(2015).

Rodrik, D. (2000) 'Institutions for high-quality growth: what they are and how to acquire them', Studies in International Comparative Development, 35(3).

Rabbit, Megan (2017). Democracy: a Key Ingredient for Development, US Global Leadership Coalision [Online], Available at https://www.usglc.org/blog/democracy-key-ingredient-development/ [Retrived on 26 April 2023].

Sirowy, L. and Inkeles, A. (1990). 'The effects of democracy on economic growth and inequality: a review', Studies in Comparative International Development, 25(1).

Tavares, J. and Wacziarg, R. (2001) 'How democracy affects growth', European Economic Review, 45(8).

UNDP (2002-2006). Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals, UNDP.

Uddin, Mohammad Jasim & Ashrafun, Laila (2010). The Dilemma of Politics and Development of Bangladesh, Working Paper No-10, June, 2010. University of Helsinki, Helsinki, Finland.

World Bank (2005). Nations Vissions Matter: Lessons of Success, a publication of Proceedings of A Public –Private Sector Development Forum Santiago, Chile, July 25-27, 2004.

©2021 by the authors; This is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).